International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-II, Issue-X, November 2016, Page No. 20-26
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

বাংলা উপন্যাসে নদী

পীরুপদ মালিক
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Rivers are an inseparable entity of nature. They represent the mobility of life. A river cannot be confined into a small area of land. Rather an area of land is often dominated by various rivers. Geographically, the history of the transformation of land in Bengal is completely ruled by rivers. Not only Bengal, but our whole country is also favoured by innumerable rivers. Many rivers flow through West Bengal and Bangladesh and those very rivers have made their room in Bengali Literature. In the era of early significant Bengali novels the rivers seemed to be the leading factor, yet they cannot be called river-centric novels. In this essay an effort has been made to highlight the variegated influence of rivers on Bengali novels from the early stage. The role of rivers in the novels of PyariChand Mitra ('Alaler Gharer Dulal'), Bankimchandra, Kaliprasanna Singha, Mir Mosaraf Hossain, Haraprasad Sastri, Rabindranath and Saratchandra has been discussed chronologically up to 1935 since 'Padmanadir Majhi' (1936) is considered to be the first significant river-centric Bengali novel. In all the novels of Bankimchandra except 'Durgesnandini' there are references of rivers. In Tagore's novels such as 'Chokher Bali', 'Gora', 'Chaturanga', 'Noukadubi' symbolic expression of rivers can be noted. In 'Kanchanmala' of Haraprasad Sastri there is vivid description of the river Sarayu. In 'Srikanta' (Volume–1) Saratchandra depicted the river Ganga with all its splendor of beauty.

Key Words: River, History, Chronological, Bengali Novel, Symbolic Expression.

যুগ যুগ ধরে নদী এক বহমান জীবন। নদী প্রকৃতির অভিন্ন সত্তা। ভিজে যাওয়া বৃষ্টির জল, বরফশুভ্র হিমাবাহগলা জল, অথবা তুষারগলা জলকে পৃথিবী ধারণ করে। সেই জল পৃথিবীর কোল ছুঁয়ে ছুটে যায় নিশ্চিত লক্ষ্যে। নদী তো কোন ভূখণ্ডের অন্তর্গত হয় না, একটি ভূখণ্ডই নদীর অন্তর্গত হয়। ভৌগোলিক দিক থেকে, ভূমি বিবর্তনের ইতিহাসের দিক থেকে, এই বাংলা নদীব্যবস্থায় শাসিত।

অসংখ্য নদীর গভীর আনুকূল্যে গর্বিত আমাদের দেশ। সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র নদী ব্যবস্থায় পলিসঞ্চয়ের ফলে ভারতের উত্তর ভাগে যে বিশাল সমভূমির জন্ম হয়েছে, তারই পূর্ব সীমানায় পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের অবস্থান। আর এদিক দিয়েই বয়ে গেছে অসংখ্য নদী। সেই নদীগুলিই পরবর্তীকালে সাহিত্যে নানাভাবে উঠে এসেছে। বাংলা ভাষায় রচিত উপন্যাসের ধারা যখন যথার্থ উপন্যাস পর্বে উপনীত, সেই পর্বে রচিত উপন্যাসগুলিতে নদীই যেন চালিকাশক্তি। আমরা দেখতে পাই বাংলার অধিকাংশ হাট ও মেলা বসে নদীপাড়ে। বিভিন্ন পুজো-পার্বণ-উৎসবে নদীর ভূমিকা আছে। বিশেষ দিনক্ষণে বাঙালি স্নান করে নদীর জলে পুণ্যসঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষায়, ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা

ও বিনোদনমূলক উৎসব নদীকে কেন্দ্র করেই সম্পন্ন হয়। আর এই নদীকে নিয়েই বাংলা সাহিত্যে রচিত হয়েছে বেশ কিছু উপন্যাস। যথার্থ বিচারে এগুলিকে নদীকেন্দ্রিক বাংলা উপন্যাস বলা যায় না। তাই এই অধ্যায়ে আমার আলোচনার বিষয় যথার্থ নদীকেন্দ্রিক বাংলা উপন্যাস রচিত হওয়ার পূর্বে বাংলা উপন্যাসে নদী যে অনায়াসে জায়গা করে নিয়েছে তা আলোচনা করা।

সাহিত্যের ইতিহাসের কালানুক্রমিক ধারাবাহিকতা দিয়ে বাংলা উপন্যাসের ধারাবাহিক ইতিহাসের দিকে তাকালে প্রথমেই যাঁর নাম আসে তিনি হলেন প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩)-এর নাম। তিনি তাঁর গ্রন্থ 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮)-এ নদীর প্রসঙ্গ এনেছেন দু'এক জায়গায়। তিনি লিখেছেন- "রামলাল মায়ের ও ভগিনীর নিকট সর্ব্বদা থাকিতেন, বৈকালে বরদাবাবুকে লইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন। একদিন পর্যটন করিতে করিতে দেখিলেন সম্মুখে একটি মনোরম আশ্রয়, সেখানে এক প্রাচীন ব্যক্তি বসিয়া ভাগীরথীর শোভা দেখিতেছেন-নদী বেগবতী-বারি তর্‌তর্‌ শব্দে চলিয়াছে-আপনার নির্ম্মলত্ব হেতু বৈকালিক বিচিত্র আকাশকে যেন ক্রোড়ে লইয়া যাইতেছে।"[১]

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) উপন্যাসে নদীর প্রসঙ্গ এসেছে একাধিকবার, প্রায় অপরিহার্যভাবে। দেশাত্ববোধ প্রকাশে, প্রণয়াসক্ত নর-নারীর বিচরণভূমির চিত্রায়ণে, প্রকৃতির বহুমাত্রিক রূপের উপস্থাপনায় বঙ্কিম বহুবার নদীর দারস্থ হয়েছেন। বঙ্কিম-উপন্যাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোতে নদীর অবস্থান ও উল্লেখ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) উপন্যাসে নদী ব্যবহৃত হয়েছে প্রধানত কাহিনির পটভূমি হিসাবে। কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশের বির্মষতাকে উপেক্ষা করে নৌকো যাত্রা সম্ভব ছিল না। সমস্যাক্লিষ্ট নৌকোরাহীদের নিশ্চিত করে মাঝিকে নৌকো আপাতত বেঁধে দিতে বলে। যথাসময়ে রৌদ্রালোকে তারা দেখে রসুলপুরের নদী উপকূলে তারা সমাগত। পূর্ব-মেদিনীপুরের এই নদী বারো মাইল দীর্ঘ। যাইহোক রসুলপুরের এই তটভূমিতেই নৌকোরাহীদের আহারাদির ব্যবস্থাপনায় নেমে নবকুমার একাকী পরিত্যক্ত হয়। জোয়ারে নৌকো ভেসে যায়। দৌলতপুর ও দরিয়াপুরের নিকটবর্তী নদীতটে দাঁড়িয়ে নবকুমারকে সমুদ্রের বর্ণনা করতে শুনি- "ফেনিল নীল অনন্ত সমুদ্র! উভয়পার্শ্বে যতদূর চক্ষু যায়, ততদূর পর্যন্ত তরঙ্গভঙ্গ প্রক্ষিপ্ত ফেনার রেখা; স্তূপীকৃত বিমল কুসুমদামগ্রথিত মালার ন্যায় সে ধবল ফেনরেখা হেমকান্ত সৈকতে ন্যস্ত হইয়াছে, ... এ সময়ে অস্তগামী দিনমণির মৃদুল কিরণে নীলজলের একাংশ দ্রবীভূত সুবর্ণের ন্যায় জ্বলিতেছিল।"[২]

স্বর্ণোজ্জ্বল বিভা যেভাবে সমুদ্রের গায়ে জড়িয়ে আছে তা নবকুমারের শিল্পী-চোখ দিয়েই পাঠকের হৃদয়গম্য হয়। এরপর পান্থনিবাসে অপরিচিতা রমণীরূপে বিমোহিত নবকুমার তার বর্ণনায় নদীর উপমাই খুঁজে পায়- "সুন্দরীর বয়ঃক্রমে সপ্তবিংশতি বৎসর-ভাদ্র মাসের ভরা নদী। ভাদ্র মাসের নদীজলের ন্যায়, ইহার রূপরাশি টলটল করিতেছিল-উছলিয়া পড়িতেছিল বর্ণাপেক্ষা, নয়নাপেক্ষা, সর্বাপেক্ষা সেই সৌন্দর্যের পরিপ্লব মুগ্ধকর। পূর্ণযৌবনভরে সর্বশরীর সতত চঞ্চল; সে চঞ্চল মুহুর্মুহু নূতন নূতন শোভাবিকাশের কারণ।"[৩] গঙ্গাসাগর থেকে যাত্রীপূর্ণ নৌকাটি ফেরার সময় পথ হারিয়ে রসুলপুরের নদীর মোহনায় পৌঁছায়। এখানে নদীর বিপুল বিস্তার ও জলরাশির অপূর্ব বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। আবার কাহিনির শেষে দেখতে পাই পুরুষবেশী পদ্মাবতীর প্রকৃত পরিচয় নবকুমারকে জানিয়ে দিয়ে, সংসারের বন্ধন থেকে মুক্তি নিয়ে কপালকুণ্ডলা মিশে যায় নদীপ্রবাহ মধ্যে। নবকুমার কিছুক্ষণ সাঁতার দিয়ে কপালকুণ্ডলার খোঁজ করতে লাগলেন কিন্তু পেলেন না। তারপর ঔপন্যাসিকের অনন্ত জিজ্ঞাসা- "সেই অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে, বসন্তবায়ুবিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আন্দোলিত হইতে হইতে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার কোথায় গেল?"[৪]

কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০) উনিশ শতকের বাবু উপাখ্যান লিখেছেন 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' (১৮৬৮)। এই গ্রন্থে তিনি জীবনাচরণের উদ্ভট অসঙ্গতি ও রুচিবিকারকে ব্যঙ্গচ্ছলে ছিন্ন-দীর্ণ করাই উদ্দেশ্য ছিল। এখানেও নদী প্রকৃতি বর্ণনার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। 'মাহেশের স্নানযাত্রা' শীর্ষক অংশে গঙ্গা ভ্রমণের চিত্র অঙ্কন করেছেন

লেখক- "গঙ্গারও আজ চূড়ান্ত বাহার! বোট, বজরা, পিনেস ও কলের জাহাজ গিজগিজ কচ্চে; সবগুলো থেকেই মাৎলামো, রং, হাসি ও ইয়ারকির গর্‌রা উঠছে; কোনটিতে খ্যামটা নাচ হচ্চে, গুটি ত্রিশ মোসাহেব মদে ও নেশায় ভোঁহয়ে রং কচ্চেন।"[৫]

'মৃণালিনী' (১৮৬৯) উপন্যাসের শুরুই হয়েছে গঙ্গা-যমুনা প্রসঙ্গ দিয়ে- "একদিন প্রয়াগতীর্থে, গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে, অপূর্ব প্রাবৃট্‌দিনান্তশোভা প্রকটিত হইতেছিল। প্রাবৃট্‌কাল, কিন্তু মেঘ নাই, অথবা যে মেঘ আছে, তাহা স্বর্ণময় তরঙ্গ মালাবৎ পশ্চিম গগনে বিরাজ করিতেছিল। সূর্যদেব অস্তে গমন করিয়াছিলেন।"[৬] এই উপন্যাসে অসহায়া-আশ্রয়হীনা হেমচন্দ্র পরিত্যক্তা মৃণালিনীর অন্তর্যন্ত্রণার গভীর প্রকাশে গিরিজায়ার গানে আসে নদীতে ভাসমান তরণীর উপমা-

"যাহারে কাণ্ডারী করি, সাজাইয়া দিনু তরী,
সে কভু না দিল পদ তরণীর অঙ্গে।।"[৭]

প্রিয়তম পুরুষের সম্মতি না পাওয়ায় নারী হৃদয়ে যে কথা বাজতে থাকে তাই গিরিজায়ার গানে ব্যক্ত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদের নামই 'নগেন্দ্রের নৌকাযাত্রা'। সেখানে নগেন্দ্র নিজের বজরায় যাচ্ছিলেন, নদীপথে তিনি দুই-এক দিন যেতে যেতে উপভোগ করেন নদীর প্রাণময়ী রূপকে- "নদীর জল অবিরল চল্ চল্ চলিতেছে- ছুটিতেছে- বাতাস নাচিতেছে- রৌদ্র হাসিতেছে- আবর্তে ডাকিতেছে। জল অশান্ত- অনন্ত- ক্রীড়াময়।"[৮] এরপর নগেন্দ্র প্রদোষের আসন্ন অন্ধকারে উদ্যানের ভিতরে বাপীতটে একাকী বসে কুন্দনন্দিনীর চিন্তায় মগ্ন। হৃদয় দহনের তীব্র জ্বালা সহ্য করে নেবার শক্তি খুঁজতেই কি কুন্দ জলাশয়তীরে এসেছিল? আসলে নদীর জলে অবিরল গতিধারা। কিশোরীর মতই তার স্রোত চঞ্চল, নৃত্যময়। নদীর দু'পাশে শুধু জীবনের ছবি। এভাবে নদী এখানে হয়ে ওঠে জীবনের প্রতীক। এরপর নদীই রচনা করে এই উপন্যাসের পটভূমি।

'ইন্দিরা' (১৮৭৩) উপন্যাসে নদীর গুরুত্ব অপরিসীম। ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসের পঞ্চম পরিচ্ছেদে গঙ্গানদীর প্রবাহ পথে তাঁর রূপ-সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছেন- "গঙ্গার প্রশস্ত হৃদয়। তাহাতে ছোট ছোট ঢেউ- ছোট ঢেউর উপর রৌদ্রের চিকিমিকি- যতদূর চক্ষু যায়, ততদূর জল জ্বলিতে জ্বলিতে ছুটিয়াছে- তীরের কুঞ্জের মত সাজান বৃক্ষের অনন্ত শ্রেণী; জলে কতরকমের কত নৌকা, জলের উপর দাঁড়ের শব্দ, দাঁড়ী মাঝির শব্দ, জলের উপর কোলাহল, তীরে ঘাটে ঘাটে কোলাহল; কতরকমের লোক, কতরকমে স্নান করিতেছে।"[৯] ইন্দিরার এই গঙ্গা দর্শনে স্বামীসুখ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে দুঃখের জীবন প্রবাহিত হয়েছিল তা তাঁর প্রাণ আহ্লাদে ভরে যায়। মুহূর্তের জন্য তাঁর সব দুঃখ দূর হয়ে যায়। অতৃপ্ত নয়নে সে দেখে এই গঙ্গায় জোয়ার এলে জলের সীমা কীরূপ হয়। আবার সে জেলেদের মোচার খোলার মত ডিঙিতে চড়ে মাছ ধরতেও দেখে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে ঘাটের রানায় বসে শাস্ত্রীয় বিচার করতেও সে দেখে। অর্থাৎ ইন্দিরার দুঃখের মাঝে ক্ষণিকের জন্য তাঁর মনে আনন্দের ধ্বনি এনে দিয়েছে এই গঙ্গানদীর প্রবাহ পথের সৌন্দর্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫) উপন্যাসেও দুই নর- নারীর প্রণয়ের পটভূমি নদীদেশ। ভাগীরথী তীরের এক রোমান্টিক পরিবেশে কিশোর প্রতাপ ও বালিকা শৈবলিনীর শৈশব প্রেমের মধুময় বাতাবরণ সৃষ্টি করে- "ভাগীরথীতীরে আম্রকাননে বসিয়া একটি বালক ভাগীরথীর সান্ধ্য জলকল্লোল শ্রবণ করিতেছিল। তাহার পদতলে, নবদূর্বাশয্যায় শয়ন করিয়া, একটি ক্ষুদ্র বালিকা, নীরবে তাহার মুখপানে চাহিয়াছিল- চাহিয়া, চাহিয়া, চাহিয়া, আকাশ নদী বৃক্ষ দেখিয়া, আবার সেই মুখপানে চাহিয়া রহিল। বালকের নাম প্রতাপ-বালিকার শৈবলিনী।"[১০] এভাবেই তারা গঙ্গার অনুপম পটভূমিতে ভালবাসল পরস্পরকে। কিন্তু শৈবলিনী প্রতাপের জ্ঞাতিকন্যা হওয়ায় তাদের সামাজিক বিবাহের পথ বন্ধ ছিল। তাই তারা সুদীর্ঘ পরামর্শের পর একদিন গঙ্গাস্নানে গেল। বর্ষার গঙ্গা চঞ্চল

গতিতে ছুটছে সরবে। তারা দু'জনে সেই জলরাশির মধ্যে সাঁতার কাটতে লাগল- "দুইজনে সাঁতার দিতে আরম্ভ করিল। সন্তরণে দুইজনেই পটু, তেমন সাঁতার দিতে গ্রামের কোন ছেলে পারিত না ... দুইজনে সেই জলরাশি ভিন্ন করিয়া, মথিত করিয়া, উৎক্ষিপ্ত করিয়া, সাঁতার দিয়া চলিল।"[১১] গঙ্গা এখানে প্রতীকী ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। গঙ্গার চঞ্চল জলধারা যেন প্রতাপ ও শৈবলিনীর অন্তরে প্রেমপ্রবাহ- যাতে তারা গা ভাসিয়ে দিয়েছে। সামাজিক অনুশাসনের জন্য তাদের বিবাহ অসম্ভব জেনেই তারা গঙ্গার বুকে আত্মবিসর্জন করে মিলিত হতে চাইল। এই উপন্যাসে পরবর্তী অংশেও নদীর কথা এসেছে ঘুরেফিরে এবং প্রতাপ-শৈবলিনীর সাঁতার দৃশ্যেরও অবতারণা করা হয়েছে একাধিকবার।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন কর্মসূত্রে চব্বিশ পরগণার বারাসতে থাকতেন, তখন 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়েছিল 'রজনী'। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে। রজনীর বাপের বাড়ি হুগলিতে। দুষ্ট হীরালাল রজনীকে গঙ্গা নদীর উপরে নৌকাতে বিবাহের প্রস্তাব দেয়, রজনী অসম্মত হলে নদীতীরেই নামিয়ে দেয় হীরালাল। একাকিনী অসহায় রজনী কাতর মিনতি জানাতে থাকে। কিন্তু শেষরক্ষা হয় না। একসময় রজনী গঙ্গাতে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলে; মৃত্যু হয় না। একটি নৌকার আরোহীরা তাকে তুলে নিলেও, আর এক দুষ্ট আরোহী তাকে কলকাতা পৌঁছে দেবার অছিলায় গঙ্গাতীরে নামিয়ে আক্রমণ করে- সেখানেই হাজির হয় রজনীর উদ্ধারকর্তা অমরনাথ। অর্থাৎ কাহিনির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গতি পেয়েছে গঙ্গানদীকে কেন্দ্র করেই।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকায় 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) উপন্যাসটি লেখা হলেও মহেন্দ্র ও কল্যাণী বহু দুঃখভোগের পরে পরস্পরের দেখা পায় এক কল্লোলিনী নদীতীরে,- "এক স্থানে অরণ্যমধ্য দিয়া একটি ক্ষুদ্র নদী কল-কল শব্দে বহিতেছে। জল অতি পরিষ্কার, নিবিড় মেঘের মতো কালো, দুই পাশে শ্যামল শোভাময় নানাজাতীয় বৃক্ষ নদীকে ছায়া করিয়া আছে, নানা জাতীয় পক্ষী বৃক্ষে বসিয়া নানাবিধ রব করিতেছে। সেই রব- সেও মধুর-মধুর নদীর রবের সঙ্গে মিশিতেছে। তেমন করিয়া বৃক্ষের ছায়া আর জলের বর্ণ মিশিয়াছে। কল্যাণীর মনও বুঝি সেই ছায়ার সঙ্গে মিশিল।"[১২] বঙ্কিমচন্দ্র এখানে নদী ও নারীর মধ্যে অপূর্ব সৌসাদৃশ্য রচনা করেছেন। 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪) তে চাঁদনী রাতে বর্ষার ত্রিস্রোতার বুকে বজরায় বসে দেবী চৌধুরাণীর যে বীণাবাদনরত মূর্তি বঙ্কিমচন্দ্র এঁকেছেন তা অতুলনীয়। ত্রিস্রোতা নদী বর্ষার জলরাশিতে কূলে কূলে পরিপূর্ণ। সেই বিশাল জলধারা সমুদ্রের অভিমুখে ছুটে চলেছে। এ নদীর বুকে অনতিদূরে বাঁধা একটি বজরায় দেবী চৌধুরাণী বীণাবাদনে রত। তাঁর রূপলাবণ্য, যৌবনের উদ্বেলতা একাত্ম হয়ে গেছে বর্ষার ত্রিস্রোতার সঙ্গে- "এ সুন্দরী কৃশাঙ্গী নহে- অথচ স্থূলাঙ্গী বলিলেই ইহার নিন্দা হইবে। বস্তুতঃ ইহার অবয়ব সর্ব্বত্র ষোল কলা সম্পূর্ণ- আজি ত্রিস্রোতা যেমন কূলে কূলে পুরিয়াছে, ইহারও শরীর তেমনই কূলে কূলে পুরিয়াছে ... জল অস্থির, কিন্তু নদী অস্থির নহে, নিস্তরঙ্গ। লাবণ্যচঞ্চল, কিন্তু সে লাবণ্যময়ী চঞ্চলা নহে- নির্ব্বিকার। সে শান্ত, গম্ভীর, মধুর অথচ আনন্দময়ী; সেই জ্যোৎস্নাময়ী নদীর অনুষঙ্গিনী।"[১৩] নারীরূপের চিত্রণে নদীর উপমা যেন একে একে পুষ্পদলের মতো উন্মোচিত হয়। নদীবক্ষেই দেবীর বীণাবাদনের ঝিঁঝিট-খাম্বাজ-সিন্ধুর-মিঠে সুরের সঙ্গে কেদার-হাম্বীর-বেহাগ- এর গম্ভীর ঝঙ্কারের সঙ্গে কানাড়া-সাহানা-বাগীশ্বরীর জাঁকাল রাগিণী মিলে-মিশে একাকার ঐকতান নদীকল্লোল স্রোতে ভেসে যায়। অবশেষে বিদ্যাবতীর বীণার ঝঙ্কারে দেবীর নিদ্রা ঘোচে; এবং রঙ্গরাজের দূরবীনে ধরা পড়ে নতুন এক বজরা। এভাবেই দেবী চৌধুরাণীর জীবন নাট্যের বৃহত্তর ভূমিকা নেয় নদী।

এ যুগের আর একজন বিশিষ্ট গদ্যশিল্পী মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭- ১৯১২)। তিনিও বাংলা গদ্যকে পুঁথিপত্রের আঙিনা থেকে টেনে বার করে তৎসমশব্দ-প্রধান গদ্যের ঋজুভূমিতে নিয়ে এলেন। তাঁর 'বিষাদসিন্ধু' (১৮৮৫-৯১) শিল্প-সুষমামণ্ডিত গদ্যের প্রধান নিদর্শন। ফোরাতের কূলে এজিদ কর্তৃক হোসেন-পরিবার নিধনের কাহিনি লিখেছেন তিনি এই গ্রন্থে। এখানেও নদী প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবে এসেছে- "শত্রুপক্ষের শিবিরস্থ সৈন্য একেবারে নিঃশেষিত করিয়া হোসেন ফোরাতকূলের দিকে অস্ত্র চালাইলেন। ফোরাতরক্ষীরা হঠাৎ পলাইল না, কিন্তু

অতি অল্পক্ষণ হোসেনের অসির আঘাত সহ্য করিয়া আর তিষ্টবার সাধ্য হইল না। কেহ জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল, কেহ জলে লুকাইল, কেহ কেহ অন্য দিকে পলাইল। কিন্তু বহুতর সৈন্যই হোসেনের অস্ত্রাঘাতে দ্বিখণ্ডিত হইয়া রক্তস্রোতের সহিত ফোরাত স্রোতে ভাসিয়া চলিল।"[১৪]

বঙ্কিম সমসাময়িক ঔপন্যাসিক হলেন দামোদর মুখোপাধ্যায় (১৮৫২-১৯০৭)। তিনি 'ললিতমোহন' উপন্যাসেও নদীর প্রসঙ্গ এনেছেন। এই উপন্যাসে যমুনা নদীর কথা আছে। যমুনার তীরের সন্ধ্যারতির এক মনোরম পরিবেশ বর্ণনায় লিখেছেন- "সায়ংকালে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে রাধিকা সুন্দরী আরতি দর্শনের ইচ্ছা করিলেন।... সন্ধ্যাসমাগমে সেই স্থানে এক বেদিকার উপর দণ্ডায়মান হইয়া ব্রাহ্মণ বহু দীপযুক্ত দীপাধার হস্তে কালিন্দীর আরত্রিক করিয়া থাকেন, সেই পবিত্র ব্যাপার দর্শনের নিমিত্ত তথায় তৎকালে লোকারণ্য হইয়া থাকে।"[১৫]

বঙ্কিমচন্দ্রের পরেই বাংলা কথাসাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ। সময় ও সমাজের সঙ্গে যুক্ত জীবনভাবনার প্রত্যক্ষ জোরালো প্রকাশ তাঁর কথাসাহিত্যেকে এক স্বতন্ত্র মাত্রা দান করেছে। পৈতৃক জমিদারি দেখাশোনার জন্য রবীন্দ্রনাথকে ছকেবাঁধা জীবনের চৌহদ্দি ছেড়ে নদনদী ভরা গ্রামবাংলার জলে স্থলে ভেসে বেড়াতে হয়েছে। গঙ্গা-পদ্মা-ইছামতীর জলকল্লোল এবং তার তীরবর্তী জনকল্লোল রবীন্দ্রনাথকে অনাস্বাদিতপূর্ব বাংলাদেশের সঙ্গে পরিচিত করেছে। আর সেই পরিচয়ের এক বাস্তব রসোজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের রচনায়।

'নৌকাডুবি' (১৯০৬) উপন্যাসে নদী কাহিনির পটভূমি রচনা করেছে। বিবাহ করে ফেরার সময় রমেশের নৌকা পদ্মার বুকে ঘোরতর দুর্যোগের মুখে পড়ে এবং নৌকাডুবি হয়ে যায়। নদীকে অবলম্বন করে কাহিনি জটিল আকার ধারণ করে। 'গোরা' (১৯১০) উপন্যাসের একবিংশ পরিচ্ছেদে ও ত্রিংশ পরিচ্ছেদে নদীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ করা যায়- "আজ কিন্তু নদীর উপরকার ওই আকাশ আপনার নক্ষত্রালোকে অভিষিক্ত অন্ধকার দ্বারা গোরার হৃদয়কে বারংবার নিঃশব্দে স্পর্শ করিতে লাগিল। নদী নিস্তরঙ্গ..."[১৬] নদী গোরার জীবন জিজ্ঞাসার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। রাতের শান্ত, নিস্তরঙ্গ গঙ্গা, তার উপরে নক্ষত্রখচিত বিশাল আকাশ নদীর পরপারে গাছগুলির কালিমা সব মিলিয়ে গোরার উপলব্ধির এক স্বতন্ত্র জগতের দ্বার উন্মোচন করল।

'চতুরঙ্গ' (১৯১৬)-তে নদীর প্রতীকী ব্যবহার লক্ষ করা যায়। জীবনের সত্যকে অনুসন্ধান করার জন্য শচীশ যখন আত্মমগ্ন তখন একদিন সে সকালে নদী পার হয়ে ওপারে বালুচরে চলে যায়। দামিনী তার জন্য খাবারের থালা নিয়ে ওপারে গিয়ে উপস্থিত হলে তার চোখে পড়ে- "চারিদিকে ধুধু করিতেছে- জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই। রৌদ্র যেমন নিষ্ঠুর, বালির ঢেউগুলাও তেমনি।"[১৭] নদীচরে বালির ঢেউগুলির মধ্যে বিরাট শূন্যতা। আসলে নদীপারের এই শূন্যতা দামিনীর অন্তরেরই শূন্যতা, হাহাকার। এখানে নদী অসীম ব্যঞ্জনা নিয়ে হাজির হয়েছে রবীন্দ্র উপন্যাসে- "...নদী তোলপাড় করিয়া উঠিয়াছে, আকাশ ভাঙিয়া মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে। সেই নদীর ঢেউয়ের ছলচ্ছল আর আকাশের জলের ঝরঝর শব্দে উপরে নীচে মিলিয়া প্রলয়ের আসরে ঝমাঝম করতাল বাজাইতে লাগিল।"[১৮] এখানে নদীপ্রসঙ্গ ভাবাত্মক মহিমায় এক অসীম, অনন্তের দ্যোতনা সঞ্চার করেছে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর (১৮৫৩-১৯১৩) বিখ্যাত উপন্যাস 'কাঞ্চনমালা' (১৯১৬)। যদিও এই উপন্যাসটি রচনা করেছেন ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস অবলম্বনে। এখানে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে অন্ত্যজ-অস্পৃশ্যদের অপার দূরত্বকে নির্দেশ করার উদ্দেশ্যেই মূলতঃ এই উপন্যাসটি লিখিত। এই উপন্যাসের এক জায়গায় সরযূ নদীর প্রসঙ্গ এনেছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী- "একদিন সরযূতীরে বহুসংখ্যক লোক সংগ্রহ হইল, দেখিল, মধ্যাহ্ন সূর্যকিরণে দীপ্যমান মূর্তি দেবতা বা গন্ধর্ব্ব বা বিদ্যাধর সকলের সম্মুখে সরযূজলে ঝাঁপ দিল; সরযূ তখন উত্তাল-তরঙ্গ-মালা-পরিপ্লুত মৃত্যুর দন্তাবলীর মত বন্ধুর ... 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' বলিতে বলিতে বক্ষোভরে উত্তাল তরঙ্গমালা ভেদ

করিয়া অবিরল ঘূর্ণ্যমান হস্তদ্বয়ের দ্বরা নিজের পথ পরিষ্কার করিয়া অল্পক্ষণেই নদীর অপর পারে পঁহুছিল।"[১৯] এখানে ঔপন্যাসিক নদীর মাহাত্ম্য কথাই প্রকাশ করেছেন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসেও নদীর উল্লেখযোগ্য ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তাঁর 'শ্রীকান্ত : ১ম পর্ব' (১৯১৭) নদী তার সমস্ত রূপ-ঐশ্বর্য নিয়ে হাজির হয়েছে। গঙ্গার বুকে রাতের অন্ধকারে নৌকা নিয়ে ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্তের নৈশ অভিযান এবং তার বিচিত্র অভিজ্ঞতা-লাভের অপূর্ব বর্ণনা এ উপন্যাসের সম্পদ- "কয়েক মুহূর্তেই ঘনান্ধকারে সম্মুখ এবং পশ্চাৎ লেপিয়া একাকার হইয়া গেল। রহিল শুধু দক্ষিণ ও বামে সমান্তরাল প্রসারিত বিপুল উদ্দাম জলস্রোত এবং তাহারই উপর তীব্র গতিশীলা এই ক্ষুদ্র তরণীটি এবং কিশোরবয়স্ক দুটি বালক।"[২০] এছাড়া লেখক ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্তের নিশীথ-নৌকাবিহারের প্রসঙ্গে গঙ্গার যে বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন, বাংলা সাহিত্যে তা তুলনারহিত। গঙ্গার তীরে গভীর নিশীথে একাকী শ্রীকান্তের শ্মশান-অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে শরৎচন্দ্র নদীর প্রসঙ্গ এনেছেন- "চমকিয়া উঠিলাম। সম্মুখে চাহিয়া দেখি ধূসর বালুর বিস্তীর্ণ প্রান্তর এবং তাহাকেই বিদীর্ণ করিয়া শীর্ণ নদীর বক্ররেখা আঁকিয়া বাঁকিয়া কোন সুদূরে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। সমস্ত প্রান্তর ব্যাপিয়া এক একটা কাশের ঝোপ।"[২১] 'পথের দাবী' (১৯২৫) উপন্যাসে নদীবক্ষে সব্যসাচীর ছদ্মনামে স্টীমার যাত্রা উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

শরৎ-পরবর্তীকালে বাংলা উপন্যাস বাঁক খেয়েছে, নদীর ব্যবহার বাংলা উপন্যাস পাল্টে গেছে। উল্লিখিত উপন্যাসগুলি নদীকেন্দ্রিক বাংলা উপন্যাস নয়, এগুলি পরবর্তী বাংলা নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস রচনার পথকে প্রশস্ত করেছে। তাই বাংলা উপন্যাসে নদীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'-র হাত ধরেই বাংলা সাহিত্যের প্রথম বাংলা নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসের যথার্থ সূচনা।

সূত্র নির্দেশ :

১. প্যারীচাঁদ মিত্র, 'আলালের ঘরের দুলাল', বসুমতী সাহিত্য গ্রন্থাবলী, ১৯৭০, পৃ. ২৫৬
২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম রচনাবলী ১ (উপন্যাস), দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ ২০০৬, পৃ. ১৪১
৩. ঐ, পৃ. ১৫৫
৪. ঐ, পৃ. ১৯২
৫. কালীপ্রসন্ন সিংহ, 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা', বসুমতী সাহিত্য গ্রন্থাবলী, ১৯৭০, পৃ. ৯৬
৬. ঐ, পৃ. ১৯৯
৭. ঐ, পৃ. ২২৩
৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৭
৯. ঐ, পৃ. ৩৯৭
১০. ঐ, পৃ. ৪৬৯
১১. ঐ, পৃ. ৪৭০
১২. ঐ, পৃ. ৮৮৬
১৩. ঐ, পৃ. ১০২১
১৪. মীর মশাররফ হোসেন, 'বিষাদসিন্ধু', মশাররফ রচনাসম্ভার, দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮০, পৃ. ২৪০-২৪১

১৫. দামোদর মুখোপাধ্যায়, 'ললিতমোহন', দামোদর গ্রন্থাবলী, ২য় ভাগ, বসুমতী সাহিত্য গ্রন্থাবলী, ১৯৭০, পৃ. ১৭০
১৬. রবীন্দ্র-রচনাবলী, নবম খণ্ড, উপন্যাস, সার্ধশতজন্মবর্ষ সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০১৪, পৃ. ১১১
১৭. ঐ, পৃ. ৩৮৯
১৮. ঐ, পৃ. ৩৯১
১৯. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'কাঞ্চনমালা', গুরুদাস চ্যাটার্জী এণ্ড সন্স, ১৩২২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২০৫
২০. শরৎ রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, প্রথম দে'জ সংস্করণ, ১৯৯৩, পৃ. ১২
২১. ঐ, পৃ. ৩২